কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৯

সূরা আন নিসা (২৩-৩৩)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে, তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা তিনভাগে বিভক্তঃ এক. ঐ সমস্ত হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে 'মুহাররামাতে আবাদীয়্যা' বা 'চিরতরে হারাম মহিলা' বলা হয়। এ জাতীয় মহিলা তিন শ্রেণীরঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। দুই. কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়। তাদেরকে 'মুহাররামাতে মুআক্কাতাহ' বা সাময়িক কারণে হারাম বলা হয়। এরা আবার দু' শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পরস্ত্রী সে যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম। কিন্তু যখনই অপরের স্ত্রী হওয়া থেকে মুক্ত হবে তখনই সে হালাল হয়ে যাবে। (২) কোন কোন মহিলা শুধুমাত্র অন্যের সাথে একসাথে বিবাহ করা হারাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহ করা হারাম নয়। যেমন, দুই বোনকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা। খালা ও বোনঝিকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা।

মায়েরা বলতে মায়ের মা (নানী), মায়ের দাদী এবং বাপের মা (দাদী) ও দাদীর মা ও তার দাদী এইভাবে পর্যায়ক্রমে যত আসবে সকলেই মায়ের আওতায় পড়বে। আর মেয়ের আওতায় পড়বে, পুতনীরা, নাতনীরা এবং পুতনী ও নাতনীদের মেয়েরা। ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী বেটি মেয়ের মধ্যে শামিল হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিন ইমাম তাকে মেয়ের মধ্যেই শামিল করেছেন এবং তার সাথে বিবাহ হারাম মনে করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে বিধিসম্মত মেয়ে নয়।

কাজেই যেভাবে সে [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ](মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ত্যক্ত সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিচ্ছেন।) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সকলের ঐক্যমতে সে ওয়ারিস হয় না, অনুরূপ সে এই আয়াতেও মেয়ের মধ্যে শামিল হবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (ইবনে কাসীর) বোনের পর্যায়ে পড়বে

সহোদরা বোন, বৈপিত্রেয়ী বোন এবং বৈমাত্রেয়ী বোন সকলেই। ফুফুর মধ্যে বাপের, নানার এবং দাদার তিন প্রকার বোনরা শামিল। খালার অন্তর্ভুক্ত হল, মায়ের এবং নানী ও দাদীর তিন প্রকারের বোনরা। ভাইঝি বলতে তিন প্রকার (সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) ভাইদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে সকলেই শামিল। ভাগ্নীর পর্যায়ে পড়ে তিন প্রকার বোনদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে।

দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, দুধ মা, যার দুধ আপনি দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ, দু'বছরের মধ্যেই) পান করেছেন। দুধ বোন, সেই মহিলা যাকে আপনার আপন মা অথবা দুধমা দুধ পান করিয়েছে। আপনার সাথেই পান করিয়ে থাক অথবা আপনার আগেই কিংবা আপনার পরে আপনার অন্য ভাই-বোনদের সাথে পান করিয়ে থাক। অনুরূপ যে মহিলার আপন মা অথবা দুধমা আপনাকে দুধ পান করিয়েছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে পান করিয়ে থাকে। দুধ পানের কারণে সেই সমস্ত সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে, যা বংশীয় কারণে হারাম হয়। অর্থাৎ, দুধ মায়ের বংশীয় ও দুধ সম্পর্কের সন্তানরা দুধ পানকারীর ভাই-বোন, এই মায়ের স্বামী তার পিতা, এই পিতার বোনরা তার ফুফু, এই মায়ের বোনরা তার খালা, এবং এই মায়ের স্বামীর ভায়েরা তার চাচা হয়ে যাবে। আর দুধ পানকারী শিশুর বংশীয় ভাই-বোন ইত্যাদি দুধ পানের কারণে এই পরিবারের উপর হারাম হবে না।

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা হারাম হয় তারা হল, স্ত্রীর মা অর্থাৎ, শাশুড়ী। (স্ত্রীর নানী-দাদীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে) যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পরে পরেই সহবাস না করেই তালাক দিয়ে দেয়, তবুও তার মায়ের (শাশুড়ীর) সাথে বিবাহ হারাম হবে। তবে যদি কোন মহিলাকে বিয়ের পর সহবাস না করেই তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তার মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে। (ফাতহুল ক্বাদীর) رَبِيْبَة'রাবীবা' (সৎ বেটী) স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে। এটা শর্তের ভিত্তিতে হারাম হয়। যেমন, যদি সৎ বেটীর মায়ের সাথে সহবাস করে নেয় তবেই সে হারাম হবে, অন্যথা তার সাথে বিয়ে হালাল।فِي حُجُوْرِكُمْ (যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে) এটা অধিকাংশ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, শর্ত হিসাবে বলা হয়নি। অতএব এই মেয়ে যদি কোন অন্য কারো অভিভাবকত্বে বা অন্য স্থানে লালিতা-পালিতা হয় বা অন্য জায়গায় বসবাস করে থাকে, তবুও তার সাথে বিবাহ হারাম। حلائلহল حَلِيْلَةٌএর বহুবচন। حَلَّ يَحِلُّ (অবতরণ করা) ধাতু থেকে فَعِيْلَةٌএর ওজনে فَاعِلَةٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্ত্রীকে 'হালীলা' এই জন্য বলা হয়েছে যে, তার (অবতরণের জায়গা) বাসস্থান স্বামীর সাথেই হয়। অর্থাৎ, যেখানে স্বামী অবতরণ করে বা বসবাস করে, সেখানে সেও অবতরণ করে বা বসবাস করে। পোতা ও নাতীরাও পুত্রের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তাদের স্ত্রীদের সাথেও বিবাহ হারাম।

যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে- এখানে অভিভাবকত্ব থাকার কথাটা শর্ত হিসাবে নয়; বরং সাধারণতঃ এ ধরনের মেয়েরা মায়ের সাথেই থাকে আর মা দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তার স্বামীর কাছেই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ ধরনের মেয়েদের অভিভাবকত্ব থাকা না থাকা উভয় অবস্থাতেই তাদের বিয়ে করা হারাম। উম্মে হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আবু সুফিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করবেন? রাসূল বললেন যে, তাকে বিয়ে করা আমার জন্য জায়েয হবে না। আমি বললাম, আমি শুনেছি আপনি নাকি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। রাসূল বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার মেয়ের কথা বলছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার রাবীবা নাও হত তারপরও

আমার জন্য জায়েয হত না। কেননা, আমাকে এবং তার পিতাকে সুআইবাহ দুধ পান করিয়েছেন। তোমরা তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের বোনদের আমার কাছে বিয়ের জন্য পেশ করো না। [বুখারীঃ ৫১০৬]

আগে যা হয়েছে, হয়েছে- এখানে বুঝানো হয়েছে যে, পূর্বে এ ধরনের যা কিছু ঘটেছে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি কেউ এরূপ অবস্থায় ইসলামে প্রবেশ করে তবে তাদের মধ্য থেকে দু'জনের একজনকে তালাক দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, ফাইরোয আদ-দাইলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললামঃ আমি ঈমান এনেছি অথচ দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূল বললেনঃ তুমি তাদের যে কোন একজনকে তালাক দিয়ে দাও। [ইবন মাজাহঃ ১৯৫১, তিরমিযীঃ ১১২৯] অনুরূপভাবে এ একত্রিতকরণের মাসআলার মধ্যে এমন দু'জনকেও একত্রে বিয়ে করা জায়েয নাই, যাদের একজন পুরুষ সাব্যস্ত হলে অন্যজনের জন্য তাকে বিয়ে করা জায়েয হত না। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা এবং তার ফুফু। অনুরূপভাবে কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। [বুখারীঃ ৫১০৯]

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

২৪. আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া সব সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমর সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মাহর অর্পণ করবে। মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কুরআন কারীমে إِحْصَانٌশব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা, (ক) বিবাহ (খ) স্বাধীনতা (গ) সতীত্ব এবং (ঘ) ইসলাম। এই দিক দিয়ে مُحْصَنَاتএর হবে চারটি অর্থঃ (ক) বিবাহিতা মহিলাগণ (খ) স্বাধীন মহিলাগণ (গ) সতী-সাধ্বী মহিলাগণ এবং (ঘ) মুসলিম মহিলাগণ। এখানে প্রথম অর্থকে বুঝানো হয়েছে।

অধিকারভুক্ত দাসী বলতে ঐ সমস্ত নারীদেরকে বুঝায়, যারা কাফের ছিল। মুসলিমগণ যুদ্ধে তাদের পুরুষদের পরাজিত করে তাদেরকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে, তখন তাদেরকে মুসলিমদের জন্য বিয়ে ছাড়াই হালাল করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যোদ্ধাকে 'আওতাস'-এর দিকে পাঠান। তারা কাফেরদের উপর জয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে নিয়ে আসে। কিন্তু এরা কাফের নারী হওয়ার কারণে মুসলিমগণ তাদেরকে হালাল মনে করছিল না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরা তাদের জন্য হালাল, তবে শর্ত হলো এদের ইদ্দত শেষ হতে হবে। [মুসলিমঃ ১৪৫৬]

যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে-

(এক) অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা শুধুমাত্র মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হলেই হতে পারে। কোন কারণে যদি মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হয়, কিংবা মুসলিম দুটি রাষ্ট্রে যুদ্ধের সূচনা হয়, অথবা মুসলিমদের কোন জাতিগত বা ভাষাগত বা রাজনৈতিক দাঙ্গা হয় সেখানে যে যুদ্ধ হবে সে যুদ্ধের কারণে কাউকে অধিকারভুক্ত দাস-দাসী বানানোর অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। যদি কেউ এটা করতে চায় তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ ও ব্যভিচার। এ ধরনের লোকদেরকে ব্যভিচারের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(দুই) যে সমস্ত মেয়ে বন্দী হয় তাদেরকে ইসলামী আইন অনুযায়ী সরকারের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যে সমস্ত মুসলিম বন্দী রয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মাঝে বন্টনও করে দিতে পারে। তাই বন্দী করার সাথে সাথেই কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না। তাছাড়া কোন ক্রমেই যুদ্ধাবস্থায় এ অধিকার কারও থাকবে না। যদি কেউ যুদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(তিন) মেয়েটি গর্ভবতী নয় এতটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক মাসিক ঋতুশ্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সংগম করা যাবে না।

(চার) যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে সে-ই শুধু তাকে ভোগ করতে পারবে: অন্য কেউ নয়।

(পাঁচ) সন্তানের জননী হওয়ার পর এ মেয়েকে আর বিক্রয় করা যাবে না। মালিকের মৃত্যুর পরপরই সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

(ছয়) মালিক ইচ্ছে করলে তাকে অন্য কারো কাছে বিয়ে দিতে পারবে। তখন তার খেদমত মালিকের হবে কিন্তু মালিক তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

(সাত) কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মেটানোর অনুমতি দেয়, তবে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা, এ কাজ ও ব্যভিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে মহিলাদের মধ্যে যাদের সাথে সম্ভোগ হয়েছে তাদেরকে মাহর পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হিসেবে এ আয়াত পূর্বোক্ত ২১ নং আয়াতের মতই। [আদওয়াউল বায়ান] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে মুত'আ বিবাহের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতাআ ও সাময়িক বিয়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অসংখ্য সহীহ হাদীসে এটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের কালে মুত'আ বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোস্ত হারাম করেছেন। [বুখারী ৫১১৫, ৫৫২৩; আরও দেখুন বুখারীঃ ৪২১৬, মুসলিমঃ ১৪০৬, ১৪০৭]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর মক্কা বিজয়ের বছর সেটাকে আবার বৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এ জাতীয় বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে। [মুসলিম: ১৪০৬] এ হিসেবে মুত'আ বিবাহ প্রথমে খায়বারের যুদ্ধে হারাম করা হয়। এরপর মক্কা বিজয়ের সময় হালাল করা হয়, অথবা কোন কোন সাহাবী রাসূলের অগোচরেই না জানা অবস্থায় সেটা করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের বছর আওতাসের পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়। [যাদুল মা'আদ]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ধার্যকৃত পূর্ণ মাহর প্রদান করে স্ত্রীকে তার মাহরের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَ مَنۡ لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنۡكُمۡ طَوۡلًا اَنۡ يَّنۡكِحَ الۡمُحۡصَنٰتِ الۡمُؤۡمِنٰتِ فَمِنۡ مَّا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ مِّنۡ فَتَيٰتِكُمُ الۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاِيۡمَانِكُمۡ ؕ بَعۡضُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ ۚ فَانۡكِحُوۡهُنَّ بِاِذۡنِ اَهۡلِهِنَّ وَ اٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ مُحۡصَنٰتٍ غَيۡرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخۡدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحۡصِنَّ فَاِنۡ اَتَيۡنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى الۡمُحۡصَنٰتِ مِنَ الۡعَذَابِ ذٰلِكَ لِمَنۡ خَشِىَ الۡعَنَتَ مِنۡكُمۡ ؕ وَ اَنۡ تَصۡبِرُوۡا خَيۡرٌ لَّكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ؕ

২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে; আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মাহর ন্যায়সংগতভাবে দেবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর তাদের শাস্তি মুক্ত নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এগুলো তাদের জন্য; আর ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত, দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। স্বাধীন ইয়াহুদী-নাসারা নারীদেরকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারা নারীরা আজকাল সাধারণতঃ স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলিমদেরকে বিয়ে করে।

ঈমানদার নয় এমন দাসী বিয়ে করা জায়েয নেই। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "আর কিতাবী মহিলাদের মধ্যে যারা মুহসিনা" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫] অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হালাল করা হয়েছে। এখানে 'মুহসিনা' বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতে স্বাধীন বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কাফের দাসীদেরকে বিয়ে করা জায়েয নেই। যদিও তারা কিতাবী হয়। [তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা অপর মহিলাকে বিয়ে দেবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলা নিজেকেও বিয়ে দেবে না। যে মহিলা নিজেকে নিজে বিয়ে দেয়, সে ব্যভিচারে লিপ্ত। [ইবন মাজাহঃ ১৮৮২] অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে।

মুক্ত নারীর শাস্তির কথা এখানে বলা হয় নি। অন্যত্র বলে দেয়া হয়েছে যে, ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচার পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করা [সূরা আন-নূর: ২] সে হিসেবে এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যভিচারিনী দাসীর শাস্তি হবে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। কিন্তু ব্যভিচারী দাসের ব্যাপারটি ভিন্ন কোন আয়াতে আসে নি। তাই ব্যাভিচারিনী দাসীর শাস্তি যেভাবে অর্ধেক হয়েছে সেভাবে ব্যভিচারী দাসের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্ধেক শাস্তি হবে; কারণ দাসত্বের দিক থেকে উভয়েই সমান। এটাও এক প্রকার কিয়াস। [আদওয়াউল বায়ান] তবে এটা জানা আবশ্যক যে, দাস-দাসীরা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক তাদের কোন রজম তথা প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বা দেশান্তর নেই। [তাবারী]

দাসী বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। যাতে করে আল্লাহ্ তাআলা যখন তাকে সামর্থ দিবে, তখন যেন স্বাধীনা নারী বিয়ে করতে পারে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

২৬. আল্লাহ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সূরার শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যে নির্দেশ ও বিধান দেয়া হয়েছে এবং এই সূরা নাযিলের পূর্বে সূরা বাকারায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছিল সেসবের দিকে সামগ্রিকভাবে একটি ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে, মানব সভ্যতার প্রাচীনতম যুগ থেকে প্রতি যুগের নবীগণ ও তাঁদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ অনুসারীগণ সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার এই আইনগুলো কার্যকর করে এসেছেন। আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহের বদৌলতে তোমাদেরকে জাহেলীয়াতের অবস্থা থেকে বের করে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের জীবনধারার দিকে পরিচালিত করেছেন। [তাফহীমুল কুরআন]

وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۟ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا

২৭. আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তাঁর শরীয়তের উপর আমল করতে থাক যে কাজ তাঁর নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায়কার্য হতে তোমরা তাওবা করে থাক সে তাওবা তিনি সতুর কবুল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়। স্বীয় শরীয়তে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কার্যে ও স্বীয় ঘঘাষণায় তিনি সঠিক জ্ঞান ও পর্ণ নিপুণতার অধিকারী। প্রবত্তি পূজারীরা অর্থাৎ শয়তানের দাস ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানেরা এবং অসৎ লোকেরা

তোমাদের পদস্খলন ঘটিয়ে তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথে চালাতে চায়। [ইবনে কাসীর]

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

২৮. আল্লাহ তোমাদের ভার কমাতে চান; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হালকা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মাহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন। এসব কিছুই হাল্কা ও সহজ করার স্বার্থেই করা হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হত, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার শুধু অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। [মাআরিফুল কুরআন]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ এবং নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আরও বুঝা যায় যে, নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

আয়াতে উল্লেখিত 'বাতিল' শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায়ভাবে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরীআতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। [বাহরে মুহীত]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রির জন্য সন্তুষ্টি অপরিহার্য। [ইবন মাজাহঃ ২১৮৫। এ সন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন, "বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত (সওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে- পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে-যারা খেয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সওদা করবে।" [বুখারী: ২১০৭]

ব্যবসা করা বৈধ- এর দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম। কাতাদা বলেন, ব্যবসা আল্লাহর রিযক ও আল্লাহর হালালকৃত বিষয়, তবে শর্ত হচ্ছে, এটাকে সত্যবাদিতা ও সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে। [তাবারী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য কোন ধর্মের উপর। তাহলে সে ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বনী আদম যার মালিক নয় এমন মানত গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। যে কোন মুমিনকে লা'নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে যে কেউ কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল। [বুখারীঃ ৬০৪৭, মুসলিমঃ ১৭৬]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিমঃ ১৭৫]

وَ مَنۡ یَّفۡعَلۡ ذٰلِکَ عُدۡوَانًا وَّ ظُلۡمًا فَسَوۡفَ نُصۡلِیۡہِ نَارًا ؕ وَ کَانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰہِ یَسِیۡرًا

৩০. আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আগুনে পোড়াবো; এসব আল্লাহর পক্ষে সহজ।

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন-"যে কেউ অত্যাচার ও সীমা অতিক্রম করে একাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরত্বপণা দেখিয়ে ঐ কাজ করবে, সে জাহান্নামী হবে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এ কঠিন ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ শ্রবণ করতঃ হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত।

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا کَبَآئِرَ مَا تُنۡہَوۡنَ عَنۡہُ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَ نُدۡخِلۡکُمۡ مُّدۡخَلًا کَرِیۡمًا

৩১. তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ এমন প্রত্যেক গোনাহ যার পরিণতিতে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা আল্লাহর গযবের কথা এসেছে, অথবা লানতের কথা অথবা আযাবের কথা এসেছে, তাই কবীরা গোনাহ। কবীরা গোনাহর সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ তা সাতশ' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। [তাবারী, ইবন আবী হাতেম]

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, পাপ বা গোনাহ দুরকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার সগীরা গোনাহগুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন। যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবগুলো সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহসমূহের কাফফারা করে দেবেন।

এখানে গোনাহের কাফফার হওয়ার অর্থ এই যে, কর্তার সৎকর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 'কোন লোক যখন সালাত আদায়ের জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহবার পাপের কাফফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফফারা হতে থাকে [নাসায়ীঃ ১/১০৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৪৯]

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, অযু, সালাত প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহর কাফফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হল সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ একমাত্র তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সাহাবীগণ কবীরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মুসলিম কোন আত্মাকে হত্যা করা এবং যুদ্ধের দিনে ময়দান থেকে পলায়ন করা। [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১৩]

তিনটি কারণে কোন কাজ বড় গোনাহে পরিণত হয়ঃ **একঃ** কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর, বাপ-মার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যত বেশী হবে তার অধিকার হরণও ঠিক তত বেশী বড় গোনাহ হবে। এ কারণেই গোনাহকে 'জুলুম' ও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরককে জুলুম বলা হয়েছে।

দুইঃ আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবিলায় আত্মম্ভরিতা করা, এর ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং জেনে বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানি যে পরিমাণ নির্লজ্জতা, অহমিকা, দুঃসাহস ও আল্লাহভীতির মনোভাবে সমৃদ্ধ হবে গোনাহটিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গোনাহের জন্য 'ফিস্ক' (ফাসেকী) ও 'মাসিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনঃ যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিকৃত ও ছিন্ন করা। এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিন্ন করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যত বেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যত বেশী নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গোনাহ তত বেশী বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি বড় গোনাহ। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গোনাহের ব্যাপারে একটি অন্যটির চাইতে বেশী মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক কঠিন গোনাহ। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিতা মেয়ের সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী দুষনীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। যেখানে নিরাপত্তার আশা যত বেশী, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যত বেশী সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা যত বেশী বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে যিনা করা তত বেশী বড় গোনাহ। এই অর্থের প্রেক্ষিতে গোনাহের জন্য ‘ফুজুর’ এর পরিভাষা করা হয়। [তাফহীমুল কুরআন]

وَ لَا تَتَمَنَّوۡا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعۡضَكُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ ؕ وَ سۡـَٔـلُوا اللّٰهَ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمًا ؕ

৩২. আর যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আর আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযেগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান বা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তার কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টাসাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। তাই আয়াতের শেষাংশে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই পাবে। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেনঃ পুরুষরা যুদ্ধ করে, আমরা মহিলারা যুদ্ধ করতে পারি না তদুপরি আমাদের জন্য মীরাসের অর্ধেক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৩২২, তিরমিযীঃ ৩০২২]

অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহ রাসূল, একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান মীরাস পায়, একজন পুরুষের সাক্ষী দুইজন মহিলার সাক্ষীর সমান। আমরা যখন কোন নেক কাজ করব, তখনও কি

অর্ধেক সওয়াব হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। যাতে বলা হয়েছে যে, এটা আমার ইনসাফ এবং এটা আমিই করেছি। [আল আহাদীসুল মুখতারাহঃ ১০/১১৬-১১৭, নং- ১১৫]

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَ الَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমরা উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ মুহাজেররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসত, তখন আনসারদের নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন মুহাজেররা তাদের ওয়ারিস হত। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায়। [বুখারীঃ ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন 'আর যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে' এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কেউ কেউ অপর কারও সাথে বংশীয় কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও চুক্তিবদ্ধ হতো, এর ফলে একে অপরের ওয়ারিশ হতো। তারপর যখন আল্লাহর বাণী 'আর আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের চেয়ে বেশী হকদার' [সূরা আল-আনফাল: ৭৫; আল-আহযাব: ৬] এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তাও রহিত হয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৪৬; তাবারী]

ফুটনোট

⊡ যে সমস্ত হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে 'মুহাররামাতে আবাদীয়্যা' বা 'চিরতরে হারাম মহিলা' বলা হয়। এ জাতীয় মহিলা তিন শ্রেণীরঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম।

⊡ কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়। তাদেরকে 'মুহাররামাতে মুআক্কাতাহ' বা সাময়িক কারণে হারাম বলা হয়। এরা আবার দু' শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পরস্ত্রী সে যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম। (২) কোন কোন মহিলা শুধুমাত্র অন্যের সাথে একসাথে বিবাহ করা হারাম।

⊡ **বংশীয় সম্পর্কের কারণে** যেসব নারীদের বিবাহ করা হারাম তাদের বর্ণনা করা হয়েছে। তারা হল: মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি ও ভাগ্নী। এদেরকে বিবাহ করা চিরস্থায়ী হারাম।

⊡ **দুগ্ধ সম্বন্ধীয় কারণে নিষিদ্ধ:** বংশগত কারণে যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ দুগ্ধ সম্বন্ধের কারণেও তারা নিষিদ্ধ। তারা হল: দুধ মা, দুধ বোন, দুধ মেয়ে, দুধ খালা, দুধ ফুফু, দুধ ভাইঝি ও ভাগ্নী।

⊡ **বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যেসব নারীকে বিবাহ করা অবৈধ করা হয়েছে,** তারা হল

১. শাশুড়ী, স্ত্রীর দাদী ও নানী। এভাবে যত উর্ধ্বতন হোক না কেন।

২. স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই তার কন্যা, তার পুত্রের কন্যা ইত্যাদি হারাম হয়ে যাবে।

৩. নিজের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ (পুত্র-বধু)।
৪. পিতা, দাদা ও নানা (যতই উপরে যাক না কেন) যাদেরকে বিবাহ করেছেন।
৫. কোন মহিলাকে বিবাহ করলেই তার আপন বোন, ফুফু, খালাকে বিবাহ করা হারাম গণ্য হবে।
এছাড়াও মুশরিক নারী, কাফির নারী, অন্য পুরুষের ইদ্দত পালন করছে এমন নারী ও মুহরিম অবস্থায় রয়েছে এমন নারী বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ ব্যভিচারী নারীও বিবাহ করা হারাম, তবে যদি সে কাজ থেকে তাওবাহ করে তাহলে বিবাহ করা যাবে।

⊡ যে সকল বিবাহ শরীয়তসম্মত নয় তা হল-

১. নিকাহ শিগার তথা কারো মেয়ে বা বোনকে এ শর্তে বিবাহ করা যে, তার কাছে এ ব্যক্তির বোন বা মেয়েকে বিবাহ দেবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বিবাহ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম হা: ১৪১৭)
২. কারো জন্য বৈধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা, যেমন কোন ব্যক্তি একত্র তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করল, তারপর তালাক দিয়ে দিল যাতে পূর্বের স্বামীর জন্য বৈধ হয়। এটাকে আমাদের দেশে হিল্লা বিবাহ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা’নত করেছেন যারা এরূপ কাজ করে এবং যার জন্য করে উভয়কে। (তিরমিযী হা: ১১২০, নাসায়ী হা: ৬/১৪৯, সহীহ)
৩. মুতা বিবাহ: তা হল অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারের বছর এবং পরে ফাতহে মক্কার বছর এ ধরণের বিবাহ হারাম করেছেন। (সহীহ বুখারী হা: ৫১১৫, সহীহ মুসলিম হা: ১৪০৬)
৪. অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করা। অর্থাৎ কোন মহিলা স্বামীর সাথে বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। পরকীয়া, জবরদস্তি বা অন্য কোন পন্থায় এমন মহিলাদের বিবাহ করা হারাম। তেমনি ব্যভিচারী ও দেহ ব্যবসায়ী নারীদের বিবাহ করা হারাম, তবে তাওবা করে উক্ত কাজ থেকে ফিরে আসলে বিবাহ করা যাবে।
⊡ কুরআনে مُحْصَنَات এর **চারটি** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ ক) বিবাহিতা মহিলাগণ (খ) স্বাধীন মহিলাগণ (গ) সতী-সাধ্বী মহিলাগণ এবং (ঘ) মুসলিম মহিলাগণ।

⊡ যারা স্বাধীন মু’মিনা নারীকে বিবাহ করতে অক্ষম তারা দাসীদের চারটি শর্তে বিবাহ করতে পারে। তবে এ থেকেও ধৈর্য ধারণ শ্রেয়। একজন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির একজন ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা বৈধ **চারটি শর্তে:**

১. বাহ্যিক পবিত্র থাকতে হবে।
২. অভ্যন্তরীণ পবিত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কোন প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে পারবে না।
৩. স্বাধীন মু’মিন নারীকে মাহর ও ভরণ পোষণ দিতে অক্ষম।
৪. যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে।

⊡ বান্দার ওপর আল্লাহ তা’আলার অনুগ্রহ অসীম। আল্লাহ তা’আলা প্রদত্ত বিধান মানুষের পালন করা সাধ্যের অধীন।
⊡ প্রতিটি মানুষ তার সহজাত বাসনার কাছে দুর্বল। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ সঠিক পথ দিতে পারে।
⊡ অন্যায়ভাবে মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ খাওয়া হারাম। হালাল বস্তু ও পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈধ।
⊡ কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বা নিজেকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম।
⊡ জান, মাল, সম্পদ ও সম্মান সকল অধিকার ইসলাম যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে।
⊡ কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব এবং নেকীর কাজ। কবীরা গুনাহ ক্ষমার জন্য তাওবাহ করা শর্ত।
⊡ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ তা’আলা সাগীরাহ গুনাহ এমনিতেই মাফ করে দেবেন।